IslamHouse.com

আয়াতুল কুরসী

ও তাওহীদের প্রমাণাদি

[Bengali – বাংলা – بنغالي]



শাইখ আব্দুর রায্‌যাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-বদর



অনুবাদ: আবদুর রাকীব (মাদানী)

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

آَية الكرسي وبراهين التوحيد



عبد الرزاق بن عبد المحسن

البدر



ترجمة: عبد الرقيب رضاء الكريم

مراجعة: د/أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ভূমিকা

 

সমস্ত প্রশংসা সুউচ্চ সুমহান এবং একচ্ছত্র উচ্চতার অধিকারী আল্লাহর জন্য, যিনি মহত্ব, মহিমা এবং অহংকারের মালিক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। পূর্ণাঙ্গ বিশেষণসমূহে তিনি একক এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর ওপর এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ও পরিবার পরিজনের প্রতি বর্ষিত হউক দুরূদ-রহমত এবং শান্তি।

অতপর....

কুরআন মাজীদের সর্বমহান আয়াত 'আয়াতুল কুরসী' এবং তাতে উল্লিখিত মহৎ, স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দলীল প্রমাণসমূহের সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ও আলোচনা, যা মহত্ত্ব, বড়ত্ব এবং পূর্ণতার ব্যাপারে মহান

আল্লাহর একত্বের প্রমাণ বহন করে এবং বর্ণনা করে যে, তিনি আল্লাহ পবিত্র। তিনি ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই। নেই কোনো সত্য উপাস্য। তাঁর নাম বরকতপূর্ণ। মহান তাঁর মহিমা। তিনি ছাড়া নেই কোনো মা‘বুদ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না, আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তারই; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনের ও পিছনের সবকিছুর ব্যাপারে তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত

করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি আছে এবং এসবের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]

[আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্য]

এই বরকতপূর্ণ আয়াতটির বড় মাহাত্ম্য এবং উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। কারণ মাহাত্ম্য, সম্মান এবং মর্যাদার বিবেচনায় কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের মধ্যে এটি সর্বমহান, সর্বোত্তম এবং সুউচ্চ আয়াত। এর চেয়ে সুমহান আয়াত কুরআনে আর নেই। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটিকে সর্বোত্তম বলেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল তাঁকে বলেন,

«يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ»

"হে আবুল মুনযির! তোমার নিকট কিতাবুল্লাহর কোন আয়াতটি সর্বমহান? আমি বলি: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বেশি জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আবার সেই প্রশ্নটি করেন। তারপর

আমি বলি: (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যূল কাইয়্যূম...)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ আমার বক্ষে হাতের থাবা মেরে বলেন, আল্লাহর কসম! "লি ইয়াহ্নিকাল্ ইলমা আবাল মুনযির"।[1] অর্থাৎ এই জ্ঞানের কারণে তোমাকে ধন্যবাদ! যা আল্লাহ তোমাকে দান করেছে, তোমার জন্য সহজ করেছে এবং তা দ্বারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছেন। বিষয়টির মর্যাদা এবং সম্মান প্রকাশার্থে।

উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুন্দর বুদ্ধি-মত্তা দেখুন! যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই প্রশ্নটি করেন, তিনি ঐ আয়াতটি খোঁজ করেন যাতে কেবল কুরআনের সর্বোচ্চ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, তাওহীদ, তাওহীদের প্রমাণসমূহ সাব্যস্তকরণ, রবের মাহাত্ম্য ও ও পূর্ণাঙ্গতার বর্ণনা এবং তিনিই কেবল বান্দাদের ইবাদতের হকদার। এটি তার পূর্ণ জ্ঞান এবং সুন্দর বুদ্ধির পরিচয়। তিনি এমন

1 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১০।

কোনো আয়াতের উল্লেখ করেন নি যাতে বর্ণনা হয়েছে প্রশংসিত ব্যবহার কিংবা ফিকহী বিধি-বিধান কিংবা পূর্ব উম্মতের ঘটনা কিংবা কিয়ামতের ভয়াবহতা বা অনুরূপ কোনো বিষয়, বরং তিনি নির্বাচন করেন তাওহীদের ঐ আয়াত, যাতে কেবল তাওহীদের বর্ণনা হয়েছে এবং তাওহীদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই গভীর জ্ঞানকে অনুধাবন করার জন্য একটু চিন্তা করুন। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু দশ-বিশটি আয়াতের মধ্য থেকে এই আয়াতকে নির্বাচন করেন নি, আর না একশত-দুইশত আয়াতের মধ্যে, বরং ছয় হাজারেরও বেশি আয়াত থেকে নির্বাচন করেছেন। আর তা নির্বাচন কেনই বা তিনি করবেন না? তিনি হলেন “কারীদের প্রধান... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত থাকাবস্থাতেই তিনি কুরআনকে একত্রিত করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করেন এবং তাঁর থেকে বরকতপূর্ণ ইলম সংরক্ষণ

করেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইলম ও আমলে প্রধান”।[2]

তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানের মধ্যে এটিও রয়েছে যা বুখারী এবং মুসলিম আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ» قَالَ أُبَيٌّ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكَ لِي» فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي»

“আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যেন আমি তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সত্যিই কি আল্লাহ আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ বলেন, হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার নাম ধরে বলা হয়েছে। উবাই এটি শুনে (খুশিতে) কেঁদে ফেলেন।”[3]

---

2 যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৩৯০।

3 সহীহ বুখারী হাদীস নং ৪৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯৯।

আপনি আরও একটু চিন্তা করুন! যেন তাঁর গভীর জ্ঞান সম্পর্কে কিছু উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁকে কোনো লম্বা সময় যেমন এক সপ্তাহ বা এক মাস লাগে নি, যাতে করে তিনি এর মধ্যে আয়াতগুলো ভালো করে পড়ে নেন, মানের ব্যাপারে চিন্তা করেন; বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পরে, সেই সময়েই উত্তর দেন। তিনি এই বরকতময় আয়াতটিকে নির্বাচন করেন।

এটি একটি এমন আয়াত যাতে তাওহীদের তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পাঠ, উপকারী আলোচনা এবং ভালো বর্ণনা রয়েছে। তাওহীদের সাব্যস্ততা এবং বর্ণনা একত্রিত হয়েছে, যা এক সাথে অন্য কোনো আয়াতে একত্রিত হয় নি; বরং একাধিক আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে এসেছে। শাইখ আব্দুর রহমান আস্-সা'দী রহ. বলেন, “এই আয়াতে রয়েছে তাওহীদে উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ, আসমা ওয়াস্ সিফাত এবং তাঁর বিশাল রাজত্ব, বিস্তৃত বাদশাহী, অনন্ত জ্ঞান, মহিমা, মর্যাদা,

মহত্ব, অহঙ্কার এবং তামাম সৃষ্টির থেকে তিনি উর্ধ্বে থাকার বর্ণনা। এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ এবং গুণাবলীর আকীদার সম্পর্কে মূল আয়াত। সমস্ত সুন্দর নাম এবং সুউচ্চ গুণাবলীকে এ আয়াত শামিল করে।”[4]

হ্যাঁ! এই আয়াতটি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত অবশ্যই গভীর এবং সুক্ষ্ম, যা সাহাবীদের অন্তরে তাওহীদের মাহাত্ম্যের প্রমাণ। এটি সেই বর্ণনার অনুরূপ, যা ইমাম বুখারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ»

[4] তাফসীরে সা'দী পৃ. ১১০।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এক সারিয়্যায় (এমন অভিযান যাতে রাসূলুল্লাহ্ উপস্থিত থাকতেন না) পাঠান। তিনি সাথীদের সালাত পড়ানোর সময় (কুল হুআল্লাহু আহাদ) দ্বারা সালাত সমাপ্ত করতেন। ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো, কেন সে এরকম করত। সে উত্তরে বলে: কারণ, তাতে আল্লাহুর গুণের বর্ণনা আছে। আর আমি তা পড়তে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সুসংবাদ দাও যে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই ভালোবাসেন”।[5]

উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরাটি বারবার এবং সর্বদা পড়ার কারণস্বরূপ বলেন, তাতে আল্লাহর গুণ বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টি সাহাবীদের পূর্ণ জ্ঞান এবং তাদের অন্তরে তাওহীদের মাহাত্ম্য প্রমাণ করে।

---

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৭৫।

শাইখুল ইসলাম বলেন, "আর এটা দাবী করে, যে আয়াতে আল্লাহর গুণ বর্ণনা হয়েছে তা পাঠ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ এটা পছন্দ করেন। আর যে এটা পছন্দ করে তাকেও আল্লাহ ভালোবাসেন"।[6]

যেহেতু তাওহীদের মরতবা সর্বোচ্চ, সেহেতু সে বিষয়ের আয়াতটিও সর্বমহান এবং সে বিষয়ের সূরাগুলোও সর্বোত্তম সূরা। কুরআনের আয়াত এবং সূরাসমূহের, একটির ওপর অপরটির মর্যাদা তার শব্দ এবং অর্থের কারণে নির্ধারিত হয়ে থাকে, বাক্যালাপকারীর কারণে নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেন, "এটা জানা কথা যে, কুরআন এবং আল্লাহর অন্য কালামের একটি অপরটির ওপর প্রাধান্যতা, বর্ণনাকারীর সাথে সংযুক্তের কারণে নয়; কারণ তিনি তো এক সত্তাই, বরং যে বাণী সংঘটিত হয় সেগুলোর অর্থের কারণে হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে সে শব্দাবলীর দিক থেকে

6 আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৫/৭।

যেগুলো এর অর্থের প্রকাশক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সঠিক সুত্রে প্রমাণিত, তিনি সূরাসমূহের মধ্যে সূরা ফাতিহাকে প্রাধান্য দেন এবং বলেন, "না তাওরাতে, না ইন্‌জিলে, আর না কুরআনে তার মতো অবতীর্ণ হয়েছে।"[7] ....এবং আয়াতসমূহের মধ্যে আয়াতুল কুরসীকে প্রাধান্য দেন।

সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবন কা'বকে জিজ্ঞাসা করেন:

«يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ»

"হে আবূল মুনযির! তোমার নিকট কিতাবুল্লাহর কোন আয়াতটি সর্বমহান? আমি বলি: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বেশি জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[7] তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৭৫।

ওয়াসাল্লাম পুনরায় আবার সেই প্রশ্নটি করেন। তারপর আমি বলি: (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যূল কাইয়্যূম...)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ আমার বক্ষে হাতের থাবা মেরে বলেন, আল্লাহর কসম! হে আবুল মুনযির! এই ইলম তোমার জন্য সহজ করা হয়েছে সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ"।[8]

আয়াতুল কুরসীতে যা বর্ণিত হয়েছে তা কুরআনের অন্য কোনো একটি আয়াতেও হয় নি; বরং আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের শুরুতে এবং সূরা হাশরের শেষে একাধিক আয়াতে তা বর্ণনা করেন, একটি আয়াতে নয়।[9]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এটা জানা বিষয় যে, তাঁর সেই কালাম যাতে তিনি নিজের প্রশংসা করেন এবং নিজের গুণ ও একত্বতা বর্ণনা করেন, তা উত্তম সেই কালাম থেকে যা দ্বারা তিনি তাঁর শত্রুদের

[8] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১০।

[9] জাওয়াবু আহলিল ইলম...১৩৩।

তিরস্কার করেন এবং তাদের মন্দ গুণের বর্ণনা করেন। এ কারণে সূরা 'ইখলাস' উত্তম, সূরা 'তাব্বাত' থেকে। সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ, অন্য কোনো সূরা নয়। আর আয়াতুল্ কুরসী কুরআনের মহৎ আয়াত" ।[10]

[10] শেফাউল 'আলীল ২/৭৪৪।

[রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আয়াতুল কুরসী পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন]

আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্যের কারণে হাদীসে তা বেশি বেশি পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে, প্রতিদিন পঠিতব্য দো‘আর মধ্যে রাখতে বলা হয়েছে, যার প্রতি মুসলিম ব্যক্তি যত্নবান হবে এবং দিনে বারবার পড়বে:

১- হাদীসে প্রতি সালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম নাসাঈ আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন: “যে ব্যক্তি প্রতি ফরয সালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু বাধা হবে না।”[11]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “আমাদের শাইখ আবুল আব্বাস ইবন তাইমিয়াহ (কাদ্দাসাল্লাহু রূহাহু) থেকে

[11] আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা, হাদীস নং ১০০; সহীহ আল-জামে গ্রন্থে শাইখ আলবানী সহীহ বলেন। হাদীস নং ৬৪৬৪

জানা গেছে, তিনি বলেন, প্রতি সালাত শেষে আমি তা পাঠ করা ছাড়ি নি”।[12]

২- ঘুমাবার সময় পাঠ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার সময় তা পাঠ করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে এক রক্ষক নির্ধারণ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটে আসবে না।

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ،

---

[12] যাদুল মা‘আদ ১/৩০৪।

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ،

وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ»

"একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাতের মাল হিফাযতে নিযুক্ত করেন। রাতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি আসে এবং হাত ভরে ভরে যাকাতের খাদ্য দ্রব্য চুরি করে। আমি তাকে গ্রেফতার করি এবং বলি: আল্লাহর কসম! তোমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করবো। সে বলে: আমি দরিদ্র আমার সন্তান-সন্ততি আছে। আমি খুব অভাবী। দুঃখ শুনে আমি তাকে ছেড়ে দেই। সকাল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করেছিল? আমি উত্তরে বলি: হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার কাছে দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে, ছেলে পেলের কথা বলে। আমার মায়া চলে আসে, আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

সে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। আমার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সে অবশ্যই আসবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আসার কথা বললেন। আমি তাক লাগিয়ে থাকি। রাতে আবার হাত ভরে ভরে যাকাতের খাদ্য চুরি করে। আমি তাকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করতে চাইলে সে বলে: ছেড়ে দাও ভাই! আমি দুঃখি মানুষ, বাড়িতে আমার সন্তান-সন্ততি আছে, আমি আর আসব না। কথা শুনে তার প্রতি আমার রহম হয়। আমি ছেড়ে দেই। সকালে আল্লাহর রাসূল বলেন, আবূ হুরায়রাহ তোমার কয়দীর খবর কী? আমি উত্তরে বলি: হে আল্লাহর রাসূল! সে তার দুঃখের কথা বলে, ছোট ছোট বাচ্চার কথা বলে, শুনে আমার রহম চলে আসে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় থাকি। আবার চুরি। পাকড়াও করে বলি, এবার অবশ্যই রাসূলুল্লাহ’র নিকট

পেশ করব। এটা শেষবার, তৃতীয়বার। তুমি বলো: আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলে আমাকে ছেড়ে দাও। বিনিময়ে তোমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দিব। আল্লাহ তা দ্বারা তোমার উপকার করবেন। আমি বলি সেগুলো কী? সে বলে: যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম...) শেষ আয়াত পর্যন্ত। এ রকম করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বক্ষণের জন্য এক রক্ষক নির্ধারণ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসবে না। এরপর আমি তাকে ছেড়ে দেই। সকালে আল্লাহ্‌র রাসূল আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: গত রাতে তোমার বন্দী কী করেছে? আমি বলি: সে আমাকে এমন কিছু কথা শিক্ষা দিতে চায় যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবে। আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই কথাগুলো কী? আমি বলি: সে আমাকে বলে: ঘুমানোর উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে (আল্লাহু লা ইলাহা

ইল্লাহ হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম...) সে বলে: এরকম করলে, তোমার হিফাযতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বক্ষণের জন্য এক রক্ষক নির্ধারণ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না। (বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন) সবকিছু শুনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে আসলে মিথ্যুক কিন্তু তোমাকে সত্য বলেছে। আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন দিন ধরে তুমি কার সাথে কথোপকথন করছিলে? সে বলে: না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে ছিল শয়তান।[13]

৩- সকালে সন্ধায় যিকির-আযকার করার সময় পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ،

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১১।

فَقَالَ: مَـا أَنْتَ، جِنِّيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ قَـالَ: لَا بَـلْ جِنِّيٌّ. قَـالَ: فَنَـاوِلْنِي يَدَكَ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ، وَشَعْرُهُ شَعْرُ كَلْبٍ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِّي، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّـدَقَةَ، فَجِئْنَـا نُصِـيبُ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: فَمَا يُنْجِينَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ الْآيَـةُ الَّتِي فِي سُـورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] مَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْـبِحُ أُجِـيرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبِيثُ»

“তাঁর এক খেজুর রাখার থলি ছিল। ক্রমশ খেজুর কমতে থাকত। এক রাতে সে পাহারা দেয়। হঠাৎ যুবকের মতো যেন এক জন্তু! তিনি তাকে সালাম দেন। সে সালামের উত্তর দেয়। তিনি বলেন, তুমি কী? জিন্ন নাকি মানুষ? সে বলে: জিন্ন। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমার হাত দেখি। সে তার হাত দেয়। তার হাত ছিল কুকুরের হাতের মতো আর চুল ছিল কুকুরের চুলের মতো। তিনি বলেন, এটা জিন্নের সুরত। সে

(জন্তু) বলে: জিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। তিনি বলেন, তোমার আসার কারণ কী? সে বলে: আমরা শুনেছি আপনি সাদকা পছন্দ করেন, তাই কিছু সদকার খাদ্যসামগ্রী নিতে এসেছি। সাহাবী বলেন, তোমাদের থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? সে বলে: সূরা বাকারার এই আয়াতটি (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম)। যে ব্যক্তি সন্ধায় এটি পড়বে, সকাল পর্যন্ত আমাদের থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর যে ব্যক্তি সকালে এটি পড়বে, সন্ধা পর্যন্ত আমাদের থেকে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন এবং ঘটনার খবর দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খবীস সত্য বলেছে”।[14]

[14] হাদীসটি নাসাঈ এবং ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তারগীবে সহীহ বলেন, ১/৪১৮।

[আয়াতুল কুরসী শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখে]

এটি এবং এর পূর্বে বর্ণিত দলীলটি বান্দার রক্ষার বাপারে এ আয়াতের ক্ষমতা, কোনো স্থান থেকে শয়তান বিতাড়িত করা এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকার প্রমাণ। আর যদি তা শয়তানী অবস্থানস্থলে পড়া হয় তাহলে তা বাতিল করে দেয়, যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া তাঁর বইসমূহের বিভিন্ন স্থানে প্রমাণ করেছেন। তিনি 'আল ফুরকান' নামক বইয়ে বলেন, "সত্যতার সাথে যদি তুমি আয়াতুল কুরসী সে সময় পড় তাহলে তাদের কর্মকাণ্ড বাতিল হয়ে যায়, কারণ তাওহীদ শয়তানকে তাড়ায়।"[15]

[15] আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রাহমান ওয়া আউলিয়াইশ শায়ত্বান, পৃ. ১৪৬।

তিনি আরো বলেন, “মানুষ যদি শয়তানী চক্রান্তাস্থানে সত্যতার সাথে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তাহলে তা (যাদু-মন্ত্র) নষ্ট করে দেয়”।[16]

তিনি ‘কা‘য়েদাহ জালীলাহ ফিত তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওসীলা’ নামক গ্রন্থে আরো বলেন, “আয়াতুল কুরসী সত্যতার সাথে পড়তে হবে, পড়লে এটি অদৃশ্য হয়ে যাবে নচেৎ যমীনের ভিতরে ঢুকে যাবে অথবা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”[17]

তিনি আরো বলেন, “ঈমানদার এবং মুওয়াহ্‌হীদ ব্যক্তিদের ওপর শয়তানের কোনো প্রভাব নেই, সে কারণে তারা সেই ঘর থেকে পালায় সে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয়। অনুরূপ আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষাংশ এবং অন্যান্য কুরআনের ভীতি মুক্তকারী আয়াত পড়লেও পালায়। জিন্নদের মধ্যে কিছু জিন্ন এমন আছে যারা জ্যোতিষীদের এবং অন্যদের

16 আল-ফুরকান ১৪০।

17 কায়েদাহ জালীলাহ, পৃ. ২৮।

ভবিষ্যদ্বাণী করে, তারা সেটাই শোনায় যা তারা আকাশ থেকে (ফিরিশতাদের আলোচনার অংশ) চুরি করে শুনে নিয়েছিল। আরব ভূমিতে জ্যোতিষীর বহুল প্রচলন ছিল। তারপর যখন তাওহীদ প্রচার হয়, শয়তান পলায়ন করে। শয়তানী দুর হয় কিংবা হ্রাস পায়। এরপর এটি সেসব স্থানে প্রকাশ পায় যেখানে তাওহীদের প্রভাব ক্ষীণ”।[18]

তিনি আরো বলেন, “এই সমস্ত শয়তানী চক্রান্ত বানচাল হয় বা দুর্বল হয় যখন, আল্লাহ এবং তাঁর তাওহীদের স্মরণ করা হয় এবং করাঘাতকারী কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়, বিশেষ করে আয়াতুল কুরসী। কারণ, তা সমস্ত অস্বাভাবিক শয়তানী যড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়”।[19]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা আয়াতুল কুরসী বেশি বেশি পড়তে উদ্বুদ্ধকরণ, মুসলিম

---

18 আন-নাবুওয়াত ১/২৮০।

19 নাবুওয়াত, ১/২৮৩।

ব্যক্তির জন্যে তা এবং তাতে উল্লিখিত তাওহীদ এবং মাহাত্ম্যের অতি প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। যার সামনে কোনো বাতিল টিকে থাকতে পারে না, বরং তা বাতিলের স্তম্ভ ধ্বংস করে দেয়, বুনিয়াদ নড়বড়ে করে দেয়, ঐক্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়, মূলোৎপাটন করে দেয় এবং তার আসল ও আলামত মুছে দেয়।

পূর্বোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, দিন-রাতে এই আয়াতটি আটবার পড়া মুস্তাহাব। সকাল সন্ধ্যায় দুইবার। ঘুমাবার সময় একবার। ফরয সালাত শেষে পাঁচবার। মুসলিম ব্যক্তি যখন এটি বারবার পড়তে সক্ষম হবে, অর্থ ও চাহিদার দিক সামনে রেখে এবং পরিণাম ও উদ্দেশ্যের চিন্তার সাথে, তখন তার অন্তরে তাওহীদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে, তার মনে তাওহীদের বন্ধন দৃঢ় হবে, হৃদয়ে তাওহীদের অঙ্গিকার শক্ত হবে। এভাবে সে হয়ে যাবে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধারণকারী যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়। যেমন আয়াতুল কুরসীর পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

[আয়াতুল কুরসী পড়ার উদ্দেশ্য]

উদ্দেশ্য, অর্থ স্মরণ ব্যতীত শুধু পড়া নয়। আর না শুধু তিলাওয়াত, ভাবার্থ না জেনে। আল্লাহ যদি সমগ্র কুরআনের সম্পর্কে এটি বলেন যে, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [النساء: ٨٢] "তারা কেন কুরআনের প্রতি মনসংযোগ করে না? [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২] তাহলে সে আয়াতের মরতবা কি হবে যা সম্পূর্ণরূপে সর্ববৃহৎ ও সর্বমহান। আর তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী? তাই যদি পঠনের সময় অর্থের চিন্তা-ভাবনা না থাকে, তাহলে প্রভাব কম হবে এবং উপকারও অল্প হবে। ইতোপূর্বে শাইখুল ইসলামের উক্তি বর্ণিত হয়েছে: "যদি তা সত্যতার সাথে পড়ে" । তার কথায় এ কথাটি বারংবার উল্লেখ হয়েছে। যা দ্বারা জ্ঞাত করা হয়েছে যে, শুধু পাঠ করা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট নয়। দুই জনের মধ্যে কত বড় পার্থক্য! একজন সে যে গাফেল মনে পড়ে। আর একজন সে যে এর মহৎ এবং বরকতপূর্ণ অর্থ আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর মাহাত্ম্য

প্রকাশ করে, এ সবের চিন্তা ভাবনার সাথে পড়ে। ফলে তার অন্তর তাওহীদে পরিপূর্ণ হয় এবং ঈমান ও আল্লাহর মর্যাদা তার আত্মায় আবাদ হয়।

আয়াতুল কুরসী, এইরূপ বারবার গভীরভাবে মনযোগ সহকারে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ মহা উপকারিতা রয়েছে, যা থেকে অনেকে বেখেয়াল। তা হচ্ছে তাওহীদ ও তার রুকনসমূহের স্মরনের গুরুত্ব এবং তাওহীদের বুনিয়াদ অন্তরে গভীরকরণ ও তাতে তার সীমা বৃদ্ধিকরণের গুরুত্ব। এটা ওদের বিপরীত যারা তাওহীদের বিষয় এবং তাওহীদের চর্চা তুচ্ছ মনে করে এবং মনে করে যে, এটির শিক্ষা মানুষ কয়েক মিনিটে ও কয়েক সেকেন্ডে অর্জন করতে পারে, ধারাবাহিক ও স্থায়ী চর্চা ও স্মরণের কোনো প্রয়োজন নেই।

[আয়াতুল কুরসীর সংক্ষিপ্ত বিষয়াদি]

এই মর্যাদা সম্পন্ন মুবারক আয়াতটি দশটি বাক্য দ্বারা গঠিত। এতে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর সম্মান, মাহাত্ম্য এবং পূর্ণাঙ্গতা ও মহানুভবতার ক্ষেত্রে তাঁর একত্বের বর্ণনা হয়েছে যা, এর পাঠকারীর রক্ষা ও যথেষ্টতা সত্যায়িত করে। এতে আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমুহের পাঁচটি নাম আছে। কুঁড়িটিরও অধিক গুণের উল্লেখ আছে। ইবাদতের ব্যাপারে তাঁর একত্বের বর্ণনা এবং তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য বাতিল, এর উল্লেখ দ্বারা আয়াত শুরু করা হয়েছে। তারপর আল্লাহর পূর্ণ জীবনের বর্ণনা করা হয়েছে যার ধ্বংস নেই। তারপর তাঁর পবিত্র কাইয়ুমিয়্যাত তথা সবকিছুর ধারক (নিজের ও সৃষ্টির যাবতীয় পরিকল্পনার ধারক) এটি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর অক্ষম গুণাবলী হতে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে যেমন তন্দ্রা এবং ঘুম। অতঃপর তাঁর প্রশস্ত রাজত্বের বর্ণনা হয়েছে। বলা হয়েছে: ভুমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর দাস, তাঁর সার্বভৌমত্বে ও তাঁর অধীনে। তাঁর মহানতার

প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির কেউই তাঁর আদেশ ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। এতে মহান আল্লাহর জ্ঞানের গুণের প্রমাণ এসেছে। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টিত। তিনি জানেন অতীতে যা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে এবং যা হয় নি, যদি হত, তো কেমন হত। এতে আল্লাহ সুবহানাহুর মহানতার বর্ণনা হয়েছে তাঁর সৃষ্টিসমূহের বড়ত্বের বর্ণনার মাধ্যমে। কারণ, কুরসী যেটি সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি সৃষ্টি, যা আকাশ ও যমীনকে পরিব্যপ্ত করে আছে। তাহলে সম্মানীয় স্রষ্টা এবং মহান প্রভূ কত মহান হতে পারেন! এতে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা হয়েছে। তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় এই যে, আকাশ এবং যমীনের সংরক্ষণে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। অতঃপর দু'টি মহান নামের উল্লেখের মাধ্যমে আয়াতের সমাপ্তি করা হয়েছে।

সে দু'টি নাম হচ্ছে: 'আল্ 'আলিইউ' সর্বোচ্চ, 'আল্ আযীম' সর্বমহান। এই দু'টি নাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সম্মান ও ক্ষমতা এবং বিজয়ের দিক

থেকে সর্বোচ্চে থাকার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। তাঁর মহত্বের প্রমাণ হয় এ বিশ্বাসের মাধ্যমে যে, সর্বপ্রকার মাহাত্ম্য এবং মর্যাদার মালিক কেবল তিনি। তিনি ব্যতীত আর কেউই সম্মান, বড়াই এবং মর্যাদার হকদার নয়।

এই হচ্ছে আয়াতুল কুরসীর সংক্ষিপ্ত বিষয়াদি। এটি একটি মহান আয়াত। এতে আছে মহান অর্থ, গভীর অর্থের দলীল-প্রমাণাদি এবং ঈমানী জ্ঞানসমূহ যা, এই আয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুমহান মর্যাদা প্রমাণ করে।

মুহতারাম শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান ইবন সা'দী রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এ মর্যাদাসম্পন্ন আয়াতটি কুরআন মাজীদের সর্বমহান এবং সর্বোত্তম আয়াত। কারণ, এতে বর্ণিত হয়েছে মহৎ বিষয়াদী এবং মহান গুণাবলী। আর এ কারণেই বহু হাদীসে এটি পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং মানুষকে সকাল-সন্ধা, ঘুমানোর সময় এবং ফরয সালাতসমূহের পর পড়তে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা নিজ সম্পর্কে বলেন, (লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া) অর্থাৎ তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তাহলে তিনিই সত্য মা'বুদ যার জন্যে নির্ধারিত হবে সমস্ত প্রকারের ইবাদত, আনুগত্য এবং উপাসনা। তাঁর অগণিত করুনার কারণে এবং এই কারণে যে, দাসকে তাঁর প্রভূর দাস হওয়া মানায়। তাঁর আদেশাদি পালন করা এবং নিষেধাদি থেকে বিরত থাকা মানায়। তিনি ব্যতীত সব মিথ্যা। তাই তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত মিথ্যা। কারণ, তিনি ছাড়া সব সৃষ্টি, অক্ষম, নিয়ন্ত্রিত, তাঁরই মুখাপেক্ষী সর্বক্ষেত্রে। তিনি ব্যতীত কেউই কোনো প্রকার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী (আল্ হাইউল কাইয়ূম): 'চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী' এই দু'টি সম্মানীয় নাম কোনো না কোনোরূপে আল্লাহর সকল সুন্দর নামাবলীর ওপর প্রমাণ বহন করে। যেমন, 'হাই' তথা চিরঞ্জীব, আর 'হাই' তো সেই সত্তাই হতে পারেন, যিনি পূর্ণ জীবনের অধিকারী, সত্তার সমস্ত গুণকে আবশ্যককারী। যেমন শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা

ইত্যাদি। (আল্ কাইয়্যুম) অর্থাৎ নিজের ধারক এবং অপরের ধারক। এটি তাঁর সমস্ত কর্ম প্রমাণ করে যে, সমস্ত কর্মের গুণে তিনি গুণান্বিত যা তিনি চান। যেমন ‘আরশের উপর উঠা, অবতরণ করা, বাক্যালাপ করা, বলা, সৃষ্টি করা, রুযী দেওয়া, মৃত্যু দেওয়া, জীবিত করা এবং সব প্রকারের পরিকল্পনা করা। এসব কার্যাদি কাইয়ূম শব্দের সাথে সংযুক্ত। এ কারণে কিছু গবেষক বলেছেন: উপরোক্ত নাম দু’টি ইসমে আযম (মহান নাম) যার দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তিনি কবুল করেন এবং চাইলে তিনি দান করেন।

তাঁর পূর্ণ জীবন এবং পূর্ণ ধারক হওয়ার স্বরূপ এই যে, তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না।

(লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আর্‌দ) আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁর মালিকানাধীন’। অর্থাৎ তিনি প্রভূ, তিনি ছাড়া অন্য সব দাস। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা পরিকল্পনাকারী, আর বাকী সবকিছু সৃষ্ট, রিযিকপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রিত, যারা আকাশ এবং

যমীনে অণু পরিমাণেরও না নিজের জন্য মালিক, না অপরের জন্য মালিক।

এ কারণে আল্লাহ বলেন, (কে আছে যে, তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর আদেশ ছাড়া?) অর্থাৎ তাঁর আদেশ ব্যতীত তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। সমস্ত সুপারিশের মালিক তিনি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি রহম করতে চাইবেন, আদেশ করবেন তাকে, যাকে আল্লাহ সম্মান দিতে চাইবেন, যেন সে সেই বান্দার জন্য সুপারিশ করে। তার পরেও সুপারিশকারী আল্লাহর আদেশের পূর্বে সুপারিশ শুরু করবে না।

তার পরে আল্লাহ বলেন, (তিনি অবগত যা তাদের সম্মুখে আছে) অর্থাৎ অতীতের সমস্ত বিষয়। (এবং পশ্চাতে যা আছে) অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা কিছু হবে। সব বিষয়ের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান পূংখানুপূংখরূপে পরিবেষ্টিত। আগের ও পরের, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য, উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সবকিছু। বান্দারা এ সবের

মালিক নয় আর না অনু পরিমাণ কোনো ইলমের মালিক। কেবল ততটুকুই যতটুকু আল্লাহ তাদের শিক্ষা দেন।

এ কারণে আল্লাহ বলেন, “তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।” এটি তাঁর মাহাত্ম্যের পূর্ণাঙ্গতা এবং ক্ষমতার ব্যাপকতা প্রমাণ করে। আর এটা যদি কুরসীর অবস্থা হয়, যা মহান আকাশ এবং যমীন এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম, অথচ কুরসী আল্লাহুর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি নয়। বরং এর অপেক্ষা বড় সৃষ্টি আছে আর তা হচ্ছে ‘আরশ’। আরও যা কেবল আল্লাহই জানেন। এই সৃষ্টিগুলোর বড়ত্বতা সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, পাহাড় কম্পিত হয় এবং বীরপুরুষ কাপুরুষ হয়ে পড়ে। তাহলে তিনি কত মহান যিনি এ সবের সৃষ্টিকর্তা, আবিষ্কারক! যিনি এতে রেখেছেন কত তত্ত্ব কত রহস্য! যিনি আকাশ এবং

যমীনকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করেন বিনা কষ্টে বিনা শ্রান্তে।

এই কারণে আল্লাহ বলেন, (ওয়ালা ইয়াউদুহু) অর্থাৎ বিনা শ্রান্তে। (উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন)।

আর (তিনি সর্বোচ্চ) তাঁর সত্তায় তিনি আরশের উপর, ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি সমস্ত সৃষ্টির ওপর, অনুরূপভাবে মর্যাদার দিক থেকেও তিনি সবার উপরে, তাঁর গুণসমূহের পূর্ণাঙ্গতার কারণে।

(আল্ আযীম) সর্বাপেক্ষা মহান। যার মহানতার কাছে অত্যাচারীর অত্যাচার দুর্বল। যার মর্যাদার সামনে শক্তিশালী বাদশাহদের মর্যাদা ক্ষীণ। পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁরই যিনি মহান মহত্বের মালিক, পূর্ণ অহংকারের মালিক এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি জয়-বিজয়ের মালিক।”[20]

---

[20] তাফসীর সা‘দী, পৃ. ১১০।

ইব্নে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ তাঁর তফসীরে বলেন, “ এই আয়াতে (আয়াতুল কুরসী) দশটি বাক্য আছে..” । তারপর তিনি সে গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু করেন। এই মুবারক আয়াতটির ব্যাখ্যা এবং নির্ভুল প্রমাণাদি জানার জন্যে এর তাফসীর এবং অন্যান্য তাফসীরের বই পাঠ করা ভালো হবে।

এই বরকতপূর্ণ আয়াতের প্রমাণাদিকে কেন্দ্র করে নিম্নে তাওহীদের দলীলসমূহ এবং মহৎ সহায়ক বিষয়াদির কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো: তাওহীদ সাব্যস্ত করণার্থে এবং তাওহীদের সহায়ক বিষয়াদী বর্ণনার্থে।

[আয়াতটির শুরু কথা]

এই বরকতপূর্ণ আয়াতটি চিরন্তন তাওহীদের বাক্য দ্বারা প্রারম্ভ করা হয়েছে (মহান আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) এটি একটি মহান বাক্য, বরং সর্বাপেক্ষা মহান বাক্য। যার কারণে আকাশ-যমীন দণ্ডায়মান। যার কারণে সৃষ্টি হয় সমস্ত সৃষ্টি হয় । যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছিল

এবং আসমান হতে কিতাবসমূহ অবতরণ করা হয়েছিল। যার কারণে নেকী-বদীর পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমলনামা রাখা হয়েছে এবং জান্নাত-জাহান্নাম নির্মিত হয়েছে। এর কারণেই আল্লাহর বান্দা মুমিন এবং কাফিরে বিভক্ত হয়েছে। যার প্রতিষ্ঠিত করণের উদ্দেশ্যে কিবলা নির্মিত হয়েছে এবং মিল্লাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এটি আল্লাহ তা'আলার হক সমস্ত বান্দাদের প্রতি। ইসলামের কালেমা এবং জান্নাত তথা শান্তির বাসস্থানের চাবি। এটি তাক্বওয়ার কালেমা এবং সুদৃঢ় হাতল। এটি ইখলাসের কালেমা এবং হক্কের সাক্ষী, হক্কের আহ্বান এবং শির্ক থেকে মুক্তির ডাক। এটি সর্বোত্তম নি'আমত এবং উৎকৃষ্ট উপহার ও মিনতি।

সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার ওপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর জ্ঞান দিয়ে যে নে'আমত দান করেছেন, তার চেয়ে বড় আর কোনো নে'আমত প্রদান করেন নি।[21]

---

21 কালেমাতুল ইখলাস, ইবন রাজাব, পৃ. ৫৩।

কিয়ামত দিবসে এই কালেমার সম্পর্কে পূর্বের ও পরের লোকদের জিজ্ঞাসা করা হবে। আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর সম্মুখে ততক্ষণ নড়া-চড়া করতে পারে না যতক্ষণ না তাদেরকে দু'টি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। একটি হচ্ছে, তোমরা কার ইবাদত করতে? অপরটি হচ্ছে, নবী-রাসূলদের আহ্বানে তোমরা কতখানি সাড়া দিয়েছিলে?

প্রথমটির উত্তর: কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাহ'কে জেনে, স্বীকার করে এবং বাস্তবে আমল করার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়টির উত্তর: 'অবশ্যই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। এই সাক্ষ্য ভালোভাবে জেনে, স্বীকৃতি দান করে এবং আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।

[কালেমার উদ্দেশ্য শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়]

এই কালেমার ফযীলত এবং ইসলামে এর গুরুত্ব, বর্ণনাকারীর বর্ণনা এবং জ্ঞানীদের জ্ঞানের উর্ধ্বে। বরং এর ফযীলত এবং গুরুত্ব এত বেশি যা, মানুষের মনে

এবং অন্তরেও কখনো উদিত হয় নি। তবে মুসলিম ব্যক্তিকে এই স্থানে একটি বড় এবং মহৎ বিষয় জানা উচিৎ, যা এই বিষয়ের মগজ এবং আসল, তা হচ্ছে, এই কালেমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা আছে যা বুঝা জরুরী। কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে যা আয়ত্ব করা প্রয়োজন। জ্ঞানীদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে যে, এই কালেমার মানে না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণে কোনো লাভ নেই, অনুরূপভাবে তার চাহিদা অনুযায়ী আমল না করাতেও কোনো উপকার নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ﴾ [الزخرف: ٨٦]

"আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের আহ্বান (ইবাদত) করে, তারা সুপারিশের অধিকারী নয়।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৬]

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বলেন, অর্থাৎ কিন্তু যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়। মুখে যা বলে, অন্তরে তা বিশ্বাস করে (শুধু তাদের সাক্ষ্যই উপকারে

আসবে)। কারণ, সাক্ষ্যর দাবী হচ্ছে, যার সাক্ষী দেওয়া হচ্ছে তার সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা। অজানা বিষয়ে সাক্ষ্য হয় না। অনুরূপ সাক্ষ্যের দাবী হচ্ছে সত্যতা এবং এটির বাস্তবায়ন। বুঝা গেল, এই কালেমার সাথে আমল ও সত্যতার সাথে সাথে এর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা জরুরী। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা খৃষ্টানদের রীতি-নীতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে, যারা না জেনে আমল করে। আমলের মাধ্যমে মানুষ ইয়াহূদীদের চরিত্র থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে, যারা জানে তবে আমল করে না। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা মুনাফিকদের চরিত্র থেকে নাজাত পায়, যারা অন্তরে যা আছে, প্রকাশ করে তার বিপরীত। এরপর বান্দা আল্লাহর সরল পথ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। যাদের প্রতি গযব বর্ষণ করেন নি এবং তারা পথভ্রষ্টও নয়।

সারকথা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য ও লাভজনক হবে যে ব্যক্তি এ কালেমার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অর্থের জ্ঞান রাখে এবং তা বিশ্বাস

করে ও আমল করে। যে যবানে বলে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমল করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না সে তো মুনাফিক। আর যে মুখে বলে কিন্তু তার বিপরীত আমল করে শির্ক করে সে তো কাফির। অনুরূপ যে মুখে বলেছে কিন্তু এর কোনো জরুরী বিষয় এবং দাবীসমূহের কোনো কিছু অস্বীকার করার কারণে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে, এ কালেমা তার কোনো লাভ দিবে না যদিও সে হাজার বার তা পাঠ করে। অনুরূপ যে তা মুখে বলে অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যে কোনো প্রকার ইবাদত করে, তারও কোনো লাভ দিবে না। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো‘আ-প্রার্থনা করা, যবেহ করা, মান্নত করা, ফরিয়াদ করা, ভরসা করা, দুঃখ কষ্টের সময় প্রত্যাবর্তন করা, আশা-আকাংখা করা, ভয় করা এবং ভালোবাসা ইত্যাদি। তাই যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রকারসমূহের কোনো কিছু অন্যের জন্য করল, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা যায় না, সে তো মহান আল্লাহর সাথে শরীক করল, যদিও সে ‘লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ’ পড়ে থাকে। কারণ, এই কালেমা, তাওহীদ ও ইখলাসের যে দাবী রাখে সে অনুযায়ী সে আমল করল না, যা প্রকৃত পক্ষে এই মহান কালেমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।[22]

কারণ, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’এর অর্থ হচ্ছে: কোনো সত্য উপাস্য নেই একজন ব্যতীত, তিনি হচ্ছেন এক আল্লাহ; যার কোনো অংশীদার নেই।’ ‘ইলাহ’ অভিধানিক অর্থে উপাস্যকে বলা হয়। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো (সত্য) উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫] এর সাথে

[22] তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ. ৭৮।

আল্লাহর এই বাণীও ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [النحل: ٣٦] "অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি যেন, তারা কেবল আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুত বর্জন করে।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬] এ দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, 'ইলাহ' এর অর্থ মা'বুদ (উপাস্য) এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ কেবল এক আল্লাহর জন্যই ইবাদত সুনিশ্চিত করা এবং তাগুতের ইবাদত থেকে বিরত থাকা। এ কারণে কুরাইশ কাফিরদেরকে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করতে বলতেন, তখন তারা বলত:

﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ۝٥﴾ [ص: ٥]

"সে কি বহু মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক আশ্চার্য ব্যাপার!" [সূরা স-দ, আয়াত: ৫]

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলতে বললে হূদ নবীর কাওম তাকে বলেছিল:

﴿أَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا﴾ [الاعراف: ٧٠]

“তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যে এসেছো, যেন আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বর্জন করি?” [সুরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৭০] তারা এটি তখন বলে যখন তাদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দিকে আহ্বান করা হয়; কারণ তারা জানতো যে, এর অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাসনার অস্বীকার এবং তা কেবল এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্তকরণ, কোনো শরীক নেই। তাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমায় দু’টি বিষয় পরিলক্ষিত। একটি না বাচক আর একটি হ্যাঁ বাচক।

না বাচক হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনার অস্বীকার। তাই আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু, ফিরিশতাবর্গ

হোক বা নবীগণ, তারা উপাস্য নয়। তাদের কোনো উপাসনা হতে পারে না। এ ছাড়া অন্যরা তো আরও যোগ্য নয়।

আর হ্যাঁ বাচক হচ্ছে, শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ইবাদত সুনিশ্চিতকরণ। বান্দা তিনি ছাড়া আর কারও শরণাপন্ন হবে না। ... যেমন, দো‘আ-প্রার্থনা, কুরবানী এবং নযর-মান্নত ইত্যাদি।

কুরআনে কারীমে অনেক প্রমাণ আছে যা, তাওহীদের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ প্রকাশ করে এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। তন্মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾ [البقرة: ١٦٣]

“এবং তোমাদের মা‘বুদ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বপ্রদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কোনো মা‘বুদ নেই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩] এবং তাঁর বাণী:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينـــة: ٥]

“তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।” [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫] এবং তাঁর বাণী:

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٢٨﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٨]

“স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যাদের পূঁজা কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্যে যাতে তারা (শির্ক থেকে) প্রত্যাবর্তন করে।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৮]

আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইয়াসীনে মুমিন বান্দার ঘটনা বর্ণনায় বলেন,

﴿وَمَا لِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٢ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ ٢٣ إِنِّيٓ إِذٗا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٢٤﴾ [يس: ٢٢، ٢٤]

“আমার কী হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মা‘বুদ গ্রহণ করবো? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ২২-২৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١ وَأُمِرۡتُ لِأَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٢ قُلۡ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ

يَوۡمٍ عَظِيمٖ ١٣ قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي ١٤﴾ [الزمر: ١١، ١٤]

“বল: আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্য একনিষ্ট হয়ে তাঁর এবাদত করতে। আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। বল: আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির। বল: আমি ইবাদত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১-১৪]

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের পরিবারের মুমিন লোকটির ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَيَٰقَوۡمِ مَا لِيٓ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدۡعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ٤١ تَدۡعُونَنِي لِأَكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشۡرِكَ بِهِۦ مَا لَيۡسَ لِي بِهِۦ عِلۡمٞ وَأَنَا۠ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡغَفَّٰرِ ٤٢ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِ لَيۡسَ لَهُۥ دَعۡوَةٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَلَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣﴾ [غافر: ٤١، ٤٣]

“হে আমার কাওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহকে আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে আহ্বান কর, ইহকালে ও পরকালে তার কোনো দাওয়াত নেই! আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৪১-৪৩]

এ মর্মের প্রচুর আয়াত আছে যা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ বিশ্লেষণ করে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কথিত শরীক ও সুপারিশকারীর ইবাদত থেকে মুক্ত হওয়া এবং কেবল এক আল্লাহর জন্য ইবাদত করা। এটাই হচ্ছে উত্তম তরীকা এবং সত্য দীন, যার কারণে আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর

গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন। শুধু বুলিস্বরূপ মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা, অর্থ না বুঝা, দাবী অনুযায়ী আমল না করা, হয়তবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যেও ইবাদতের কিছু অংশ করা; যেমন প্রার্থনা করা, ভয় করা, কুরবানী দেওয়া, নযর-মান্নত ইত্যাদি করা। এরূপ করলে বান্দা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর না কিয়ামতের দিনে এটি বান্দাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে।[23]

তাই জেনে রাখা ভালো যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ শুধু একটি বিশেষ্য নয় যে, যার কোনো অর্থ নেই। আর না শুধু একটি বাক্য যার কোনো সত্যতা নেই। আর না একটি শব্দ যার কোনো মর্ম নেই। যেমন, অনেকের ধারণা। যারা বিশ্বাস করে যে এই কালেমার আসল রহস্য হচ্ছে শুধু মুখে বলা, অন্তরে কোনো প্রকার অর্থের বিশ্বাস ছাড়াই। কিংবা শুধু মুখে উচ্চারণ করা কোনো প্রকারের বুনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপন ছাড়াই। এটা কখনও এই মহান কালেমার মর্যাদা নয়। বরং এটি

[23] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, ১৪০।

একটি এমন বিশেষ্য যার আছে মহৎ অর্থ। একটি এমন শব্দ যার আছে উত্তম বিশ্লেষণ যা, সমস্ত বিশ্লেষণ হতে উৎকৃষ্ট। যার মূল কথা, আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর উপাসনা হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা এবং এক আল্লাহর উপাসনার দিকে মনযোগ দেওয়া, বিনয়-নম্রতার সাথে, লোভ-লালসার সাথে, আশা-ভরসার সাথে এবং দো‘আ-প্রার্থনার সাথে। তাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ওয়ালা কারো নিকট চাইবে না কিন্তু আল্লাহর কাছে, কারো কাছে ফরিয়াদ জানাবে না কিন্তু আল্লাহর দরবারে, ভরসা করবে না কারো ওপর, কিন্তু আল্লাহর প্রতি; আশা করবে না আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে, কুরবানী-নযরানা পেশ করবে না, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর না সে ইবাদতের কোনো অংশ গায়রুল্লাহর জন্যে করবে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর কাছে সেসব থেকে বিচ্ছেদের ঘোষণা জানাবে।

এটি অবগত হওয়ার পর জানা প্রয়োজন যে, আয়াতুল কুরসীতে তাওহীদের উজ্জ্বল দলীলসমূহ এবং স্পষ্ট

প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ইবাদতের হকদার কেবল তিনি। তিনি আল্লাহ একক, সকলের ওপর বিজয়ী। এই আয়াত উক্ত দলীলসমূহ পরস্পর ক্রমানুসারে একের পর এক এসেছে অত্যন্ত সুন্দর সাবলীলভাবে; যাতে তাওহীদের দলীলসমূহ ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রমাণাদির নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হলো:

প্রথম প্রমাণ: ﴿ٱلۡحَيُّ﴾ (আল্ হাইউ) চিরঞ্জীব:

আল্লাহ তা'আলাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এক জানার সম্পর্কে এটি স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি পবিত্র চিরঞ্জীব হওয়ার গুণে গুণান্বিত, পূর্ণ জীবনের অধিকারী, অনাদি, যার ধ্বংস এবং পতন নেই, মন্দ এবং ত্রুটিমুক্ত, মহিমান্বিত, পবিত্র আমাদের রব্ব। এটি এমন জীবন যা আল্লাহর পূর্ণ গুণসমূহকে আবশ্যক করে। এ রকম গুণের অধিকারীই ইবাদত, রুকু এবং সাজদাহ পাওয়ার হকদার। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]

“তুমি নির্ভর কর তাঁর ওপর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৮]

আর যে জীবিত কিন্তু তার মৃত্যু আছে, কিংবা যে আসলেই মৃত কোনোভাবেই জীবিত নয়, কিংবা যা জড়পদার্থ যার জীবন নেই, এ রকম কোনো কিছুই কোনো প্রকারের ইবাদতের যোগ্য নয়। ইবাদতের যোগ্য তো তিনিই যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই।

দ্বিতীয় প্রমাণ : ﴿ٱلۡقَيُّومُ﴾ (আল্ ক্কাইয়্যূম):

অর্থাৎ নিজে স্বয়ং স্বপ্রতিষ্ঠিত, তার সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠাকারী। এই নামের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে মহান আল্লাহর সকল কার্যগত গুণাবলী। আর এটা আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টিকুল থেকে পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। কারণ তিনি নিজেই নিজের ধারক এবং সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ۝١٥﴾ [فاطر: ١٥]

“হে মানবসকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৫]

অন্যত্র হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي».

“হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনই আমার উপকার করার পর্যায়ে যেতে পারবে না যে আমার উপকার করবে, আবার আমার ক্ষতি করার পর্যায়েও যেতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে”। সৃষ্টি থেকে আল্লাহ তা‘আলার অমুখাপেক্ষিতা সত্তাগত অমুখাপেক্ষিতা, কোনো বিষয়েই তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করেন না। সর্বক্ষেত্রে তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী।

অনুরূপ এই নামটি আমাদের জানাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং

তাদের উপর রয়েছে তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। তিনি তাঁর মহান ক্ষমতার মাধ্যমে তাদেরকে সুস্থির রাখছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। চোখের পলক পড়া বরাবরও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। 'আরশ, কুরসী, আকাশসমূহ, যমীন, পর্বতরাজি, গাছ-পালা, মানুষ এবং জীব-জন্তু সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَنۡ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلۡ سَمُّوهُمۡۚ﴾ [الرعد: ٣٣]

“তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক, তিনি এদের অক্ষম উপাস্যগুলোর মতো? আর তারা তাঁর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করছে। বলুন, তোমরা সে সব (মনগড়া) অংশীদারের নাম বল” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنۡ أَمۡسَكَهُمَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ٤١﴾

[فاطر: ٤١]

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ৪১]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥﴾

[فاطر: ١٥]

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلۡأَرۡضُ بِأَمۡرِهِۦۚ﴾ [الروم: ٢٥]

“তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও যমীনের স্থিত হওয়া।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৫] এই অর্থের প্রচুর আয়াত বর্ণিত হয়েছে যে, অর্থ বহন করে যে, তিনিই সমগ্র সৃষ্টির এবং সমগ্র জাহানের পরিচালক এবং পরিকল্পনাকারী।

এ দ্বারা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ সকল কার্যগত গুণাবলী, যেমন সৃষ্টি করা, রূযী দেওয়া, পুরস্কৃত করা, জীবিত করা, মৃত্যু দেওয়া ইত্যাদি সবই এ (ক্বাইয়ূম) নামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কারণ, এটির দাবী হচ্ছে এই যে, তিনিই তার সৃষ্টিকুলকে সুস্থির করেছেন, সৃষ্টি, আহার, জীবন, মৃত্যু এবং পরিচালনার দিক থেকে। যেমনিভাবে মহান আল্লাহর সকল সত্তাগত গুণাবলী, উদাহরণস্বরূপ: শ্রবণ, দর্শন, হাত, জ্ঞান প্রভৃতি তাঁর নাম ‘হাই’ (চিরঞ্জীব) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়: সমস্ত সুন্দর নামাবলীর উৎস এই দু’টি নাম (আল-হাই ও আল-ক্বাইয়ূম)। এ কারণে ইসলামী মনীষীদের একদল এই দু’টি নামকে ইসমে ‘আযম বলে অভিমত ব্যক্ত

করেছেন, যাকে মাধ্যম করে বা যার উসীলা দিয়ে দো'আ করলে দো'আ কবুল করা হয়, প্রার্থনা করলে প্রার্থনা গ্রহণ করা হয়। আর উভয়ের মর্যাদার কারণে এটি তাওহীদের প্রমাণাদি এবং দলীলাদির গুরুত্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই যার শান-মর্যাদা এই যে, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন, ধারক সৃষ্টির পরিচালক, কোনো কিছুই তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না। আর না কোনো কিছুর অস্তিত্ব হতে পারে তাঁর আদেশ ছাড়া। এ রকম গুণের অধিকারীই তো ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ না। আর তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত ভ্রষ্টতারই নামান্তর। কারণ, তিনি ব্যতীত অন্য, হয় জড়পদার্থ, যার আসলে জীবন নেই, আর না হলে জীবিত ছিল কিন্তু মারা গেছে কিংবা জীবিত আছে কিন্তু অচিরেই মারা যাবে। আর না কোনো সৃষ্টির হাতে জগতের পরিচালনা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা আছে বরং রাজত্ব ও পরিচালনা সবকিছু এক আল্লাহর হাতে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤﴾ [فاطر: ١٣، ١٤]

“আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞাত ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩-১৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ٥٦﴾ [الاسراء: ٥٦]

“বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা‘বুদ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি নেই।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬]

এবং তিনি বলেন,

﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتٗا وَلَا حَيَوٰةٗ وَلَا نُشُورٗا ٣﴾ [الفرقان: ٣]

“আর তারা তাঁর পরিবর্তে মা‘বুদরূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ওপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না।” [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৩]

এ রকম দুর্বল-অক্ষমদের ইবাদত কীভাবে করা যায়!

তৃতীয় প্রমাণ: ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ (তাঁকে না তন্দ্রা আর না ঘুম স্পর্শ করে):

তন্দ্রা বলা হয় ঘুমের পূর্বাবস্থার ঘুম ঘুম ভাবকে। আর ঘুম তো সবার জানা। আল্লাহ তা'আলা উভয় থেকে পবিত্র, কারণ তিনি পূর্ণ জীবন এবং পূর্ণ রক্ষকের অধিকারী। পক্ষান্তরে মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবিত তবে মরণশীল। তাদের জীবনে প্রয়োজন হয় আরাম-বিরামের। কারণ, তারা ক্লান্ত-ব্যথিত হয়। আর ঘুমের কারণেই হচ্ছে ক্লান্ত ও শ্রান্তবোধ করা। তাই মানুষ ক্লান্তির পর ঘুম নিলে আরাম এবং শান্তি পায়। বুঝা গেল, মানুষ তার দুর্বলতা এবং অক্ষমতার কারণে ঘুমের মুখাপেক্ষী। সে ঘুমায়, তন্দ্রা নেয়, ক্লান্ত হয়, শ্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়। এ রকম যার অবস্থা তার জন্যে কিভাবে ইবাদত করা হবে?

এই তথ্য থেকে একটি নিয়ম স্পষ্ট হয় যে, কুরআনে আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে যা কিছু অস্বীকার করা হয়, তা

দ্বারা মহান আল্লাহর পূর্ণতা প্রমাণ হয়। এ স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘুম ও তন্দ্রা অস্বীকার করা হয়েছে, তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন, তদারকি, ক্ষমতা এবং শক্তির কারণে। আর এ সবকিছুই ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁকে জরুরীভাবে একক করা ও জানার প্রমাণাদি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

“আল্লাহ তা‘আলা ঘুমায় না, আর না ঘুম তাঁকে শোভা পায়। তিনি (নেকী-বদীর) পরিমাপ নীচু করেন এবং উঁচু করেন। রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে তাঁর নিকট উঠানো হয়। তাঁর পর্দা জ্যোতি, যদি তিনি তা উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে তাঁর

চেহারার আলো সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে”।[24] তিনি সুমহান বরকতপূর্ণ।

চতুর্থ প্রমাণ: ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ﴾ **অর্থাৎ** আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক তিনি।

তিনি ব্যতীত আকাশ এবং যমীনের কোনো কিছুর কেউই মালিক নয়। অণু পরিমাণেরও মালিক নয়। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢﴾ [سبا: ٢٢]

“তুমি বল, তোমরা আহ্বান করা তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা‘বুদ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং উভয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশও নেই

[24] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯।

এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২২]

অর্থাৎ অণু পরিমাণের মালিক নয়, না তো স্বতন্ত্রভাবে আর না অংশী হিসেবে। ইহজীবনে মানুষ ততটুকুরই মালিক যতটুকু আল্লাহ তাকে মালিক করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦﴾ [ال عمران: ٢٦]

“তুমি বল, হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে কল্যাণ, নিশ্চয় আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৬]

অতঃপর মানুষ ইহজীবনে যা কিছুর মালিক তার পরিণাম দু'য়ের একটি। মৃত্যুকালে হয় তাকে সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হবে, আর না হলে সম্পদই তাকে ছেড়ে বসবে, দূর্যোগ, দূর্ঘটনা বা অনুরূপ কোনো কারণে। সেই বাগান মালীদের ন্যায় যারা প্রভাতে ফল আহরণের কসম খায় এবং ইনশাআল্লাহ বলে না। অতঃপর সেই রাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দূর্যোগ হানা দেয়। ফলে বাগান পুরে ছাই হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন! সন্ধাকালে দামী বাগানের মালিক আর প্রভাতকালে নিঃস্ব। তাই মনে রাখা দরকার, বান্দা যা কিছুর মালিক তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনি দানকারী, বঞ্চিতকারী, সঙ্কীর্ণকারী, প্রশস্তকারী, নিম্নকারী, উর্ধ্বকারী, সম্মানদাতা এবং লাঞ্ছিতকারী। আদেশ তাঁরই। রাজত্ব তাঁরই। তাই তিনিই ইবাদতের হকদার। কারণ, তার হাতে আছে দেওয়া, না দেওয়া, সম্মান এবং অপমান। তিনি ব্যতীত কেউই কোনো প্রকার ইবাদতের হকদার নয়। বরং তারা সৃষ্টি, তারা বাধ্য এবং তারা স্রষ্টার অধীনস্ত।

যে এই জগতের মালিক নয়। অণু পরিমাণেরও স্বতন্ত্রভাবে মালিক নয়। তাহলে তার উদ্দেশ্যে ইবাদতের হকদার তো তিনি যিনি এই জগতের মহিমান্বিত বাদশাহ, সম্মানিত স্রষ্টা, পরিচালক প্রভূ যার কোনো অংশী নেই।

পঞ্চম প্রমাণ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ (কে আছে যে, তাঁর সম্মুখে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?):

অর্থাৎ তার অনুমতি ব্যতীত কেউই সুপারিশ করতে পারবে না। কারণ, তিনি রাজা। আর তাঁর রাজত্বে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কিছু করতেও পারে না।

﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ﴾ [الزمر: ٤٤]

(বল! সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪] তাই এর আবেদন করা যাবে

না তাঁর আদেশ ছাড়া। আর না এর দ্বারা ধন্য হওয়া যাবে তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া।

﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ﴾ [سبا: ٢٣]

"যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না।" [সূরা সাবা, আয়াত: ২৩]

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ٢٦﴾ [النجم: ٢٦]

"আকাশসমূহে কত ফিরিশতা রয়েছে! তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি দেন।" [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন মাকামে মাহমূদ নামক স্থানে স্যুপারিশ করার মর্যাদা লাভ করবেন। তিনি নিজে আরম্ভ করবেন না

যতক্ষণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ না হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হবে,

«ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ»

“মাথা উঠাও এবং আবেদন কর, আবেদন গ্রহণ করা হবে। সুপারিশ কর, সুপারিশ কবুল করা হবে”।[25]

অতঃপর জানা দরকার যে, সুপারিশকারীর সুপারিশ সবই লাভ করবে না, বরং তা কেবল মুওয়াহহিদ ও মুখলিসদের জন্য নির্দিষ্ট, মুশরিকদের তাতে কোনো অংশ নেই। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»

[25] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩।

“আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করি: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিনে আপনার সুপারিশের কে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে আবূ হুরায়রা! আমার মনে হচ্ছে, তোমার পূর্বে এ বিষয় সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে নি, তুমিই প্রথম প্রশ্ন করেছ, যা হাদীসের প্রতি তোমার লিপ্সার পরিচয়। কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশের সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান সে, যে খাঁটি অন্তরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে”।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, ‘আবূ হুরায়রার হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَـةِ، مَنْ قَـالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» “আমার সুপারিশের সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে” এটি তাওহীদের একটি রহস্য। আর তা হলো, সুপারিশ পাবে সে যে, শুধু আল্লাহর জন্যই ইবাদতকে মুক্ত করবে। যার তাওহীদ পূর্ণ হবে সেই শাফা‘আতের বেশি হকদার হবে। এমন

নয় যে শির্ককারীও সুপারিশ লাভ করবে যেমন মুশরিকদের ধারণা”।[26]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়য়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَـهُ، وَإِنِّي اخْتَبَـأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»

“প্রত্যেক নবীর একটি গৃহীত দো‘আ আছে। প্রত্যেকেই তা অগ্রিম করেন। আর আমি আমার দো‘আকে কিয়ামতের দিনে সুপারিশস্বরূপ আমার উম্মতের জন্যে গোপন রেখেছি। আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো প্রকার শির্ক না করে মারা যাবে সে ইনশাআল্লাহ তা পাবে”।[27]

---

[26] তাহ্যীবুস্ সুনান ৭/১৩৪।

[27] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৯।

আল্লাহর প্রাপ্য অন্যকে দেওয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের যে বিশ্বাস, এ প্রমাণে তা বাতিল করা হয়েছে। তাদের ধারণা, এ সকল (উপাস্য) সুপারিশকারী এবং মাধ্যমস্বরূপ। এরা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে, যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

তারা আরো বলে:

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]

“আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

এ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই মৃত, পাথর, গাছ-পালা এবং অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা হয়। তাদের নিকট দো‘আ করা হয় এবং কুরবানী ও মান্নত করা হয়। প্রয়োজন পূরণ, বিপদ দুরীকরণ এবং বালা-মুসীবত থেকে পরিত্রানের প্রার্থনা করা হয়। তাদের বিশ্বাস, তারা তাদের আহ্বান শোনে, দো‘আ কবুল করে এবং চাহিদা পূরণ করে। এ সবই শির্ক ও ভ্রষ্টতা। প্রাচীন যুগে ও বর্তমানে সুপারিশের নামে তারা এর অনুশীলন করে আসছে। জানা দরকার, শাফা‘আতের তিনটি অধ্যায় আছে, যা ভ্রষ্ট দল জানে না, আর না হলে না জানার ভান করছে। তা হলো, আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোনো সুপারিশ হবে না। তারই জন্যে সুপারিশ হবে যার কর্ম ও কথার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ সুবহানাহু তাওহীদবাদী না হলে কারও প্রতি সন্তুষ্ট হন না।

ষষ্ঠ প্রমাণ: ﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡـدِيهِمۡ وَمَـا خَلۡفَهُمۡۖ﴾ (তাদের সামনের ও পিছনের সবকিছুই তিনি জানেন।)

অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছুতে অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি জানেন যা অতীতে হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাবে রেখেছেন। আর কিভাবেই বা তাঁর জ্ঞান সব সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না! অথচ তিনি সৃষ্টিকর্তা।

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ [الملك: ١٤]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৪]

সৃষ্টির সৃষ্টিকরণ এবং তাদের অস্তিত্বে আনয়নে এ কথার দলীল যে, তাঁর জ্ঞান এ সবকিছুতে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ١٢﴾ [الطلاق: ١٢]

“আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১২]

কথিত আছে, একদা এক নাস্তিক বলে: আমি সৃষ্টি করতে পারি। তাকে তার সৃষ্টি দেখাতে বলা হলো। সে কিছু মাংস নেয় এবং ছোট ছোট করে কাটে। তার মাঝে গোবর পুরে দেয়। তার পরে কৌটায় ভরে ছিপি এঁটে দেয় এবং এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যে, তিন ধরে তা তার কাছে রাখে। অতঃপর সে আসে। ছিপি খোলা হয়। দেখা গেল কৌটা পোকায় ভর্তি। এবার নাস্তিক বললো: এই দেখ আমার সৃষ্টি!! ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো: আচ্ছা এসবের সংখ্যা কত?

তুমি কি এদের খাদ্য দান কর? কোনোটিরও উত্তর দিতে পারে না। এবার নাস্তিককে বলা হলো: স্রষ্টা সে যে সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন, পুরুষ ও স্ত্রী চিনেন, সৃষ্টিসমূহকে খাদ্য দান করেন এবং তাদের জীবনের সময়সীমা এবং বয়সের শেষ সীমা জানেন। তখন নাস্তিক হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।[28]

আমার মনে আছে, আমি এই ঘটনাটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামী দেশসমূহের কোনো এক দেশের এক ছাত্রের নিকট বর্ণনা করি। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, যখন সে উত্তর শ্রবণ করে এবং বলে: এ মহান প্রতিউত্তরটি কীভাবে আমাদের মাঝ থেকে লুক্কায়িত! সে বলে: কমিউনিস্টরা ক্লাসে এ সংশয় বর্ণনা করত। বিশেষ করে প্রাইমারি পর্যায়ের ছাত্রদের মাঝে। ফলে মুসলিম ছাত্রদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হত। সেই ছাত্র বলে, আমার সামনে এ রকম ঘটে। সে এ উত্তরটি বড় নজরে দেখে এবং মহান মনে করে।

[28] আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, তায়মী ১/১৩০।

যাই হোক, মহান আল্লাহ, তাওহীদকে তাঁরই জন্য জরুরীভাবে সাব্যস্তকরণের প্রমাণ এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে দীনকে খাঁটি করণের প্রমাণ হিসেবে পেশ করছেন যে, তিনি সুবহানাহু সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা পরিব্যপ্ত করে রেখেছেন এবং তাঁর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকুলকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে।

﴿لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ﴾ [سبا: ٣]

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু।” [সূরা সাবা, আয়াত: ৩] এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের আক্বীদার খণ্ডন করতঃ বলেন,

﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلۡ سَمُّوهُمۡۚ أَمۡ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَم بِظَٰهِرٖ مِّنَ ٱلۡقَوۡلِۗ بَلۡ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكۡرُهُمۡ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٖ﴾ [الرعد: ٣٣]

“তারা আল্লাহর বহু শরীক করেছে, তুমি বল: তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা থেকে এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না, বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফিরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই।” [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ৩৩]

সপ্তম এবং অষ্টম প্রমাণ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ﴾ (তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।):

এই বাণীতে সৃষ্টির অক্ষমতা এবং তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদের খুবই সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [الاسراء: ٨٥]

“তামাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৫]

সে তো প্রথম অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তারা কিছুই জানত না।

﴿ وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا﴾ [النحل: ٧٨]

“আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৮]

তাদের জ্ঞান দুর্বল ও ক্ষয়মুখী।

﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡ لَا يَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٖ شَيۡـًٔاۚ﴾ [النحل: ٧٠]

“তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় নিকৃষ্টতম বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭০]

এ জীবনে তারা সম্মুখীন হয় ভুল ও অক্ষমতার।

﴿وَلَقَدۡ عَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنَسِيَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمٗا ١١٥﴾ [طه: ١١٥]

“আমরা তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমরা তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নি”। [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৫]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«نُسِّيَ آدَمُ فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُهُ»

“আদম আলাইহিস সালাম ভুলেছিলেন তাই তারা সন্তানেরাও ভুলে”।

তাদের কাছে যে জ্ঞানই এসেছে তা আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন বলেই তারা অর্জন করেছে।

﴿ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآ﴾ [البقرة: ٣٢]

“তারা বলেছিল আপনি পরম পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের

কোনোই জ্ঞান নেই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩২]

﴿ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ [العلق: ٤، ٥]

“যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।” [সূরা আল-‘আলাক্ব, আয়াত: ৪-৫]

﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۝٤﴾ [الرحمن: ٣، ٤]

“তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন বাক্ প্রণালী।” [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪]

দো‘আয়ে মাসুরায় উল্লেখ হয়েছে:

«اللَّهُمَّ علمني ما ينفعني»

“হে আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দাও তা, যা আমার জন্য লাভদায়ক”। তাই বান্দা জ্ঞানের কোনো অংশই অর্জন করতে পারে না, কেবল যখন আল্লাহ তাকে তাওফীক

দেন এবং তার জন্য তা সহজ করেন তখনই সে তা অর্জন করতে পারে।

﴿إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ “কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন” এই বাণীতে তাওহীদের আর এক অন্য প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সবকিছু আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যা চান তা হয় আর যা চান না তা হয় না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই। শাফে‘ঈ রহ. বলেন,

مَا شِئْتَ كَانَ، وإنْ لم أَشَأْ	وَمَا شِئْتُ إن لَمْ تَشأْ لَمْ يكـن
خَلقْتَ العِبَادَ لِمَا قَدْ عَلِمْتَ	فَفِي العِلْمِ يَجْرِي الفَتَى وَالْمُسِنْ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، وَمِنْهُم سَعِيد	وَمِنْهُم قَبِيحٌ، وَمِنْهُمْ حَسَنْ
عَلَى ذَا مَنَنْتَ، وَهَذا خَذلْتَ،	وذاكَ أعنتَ، وذا لم تعن
وَمِنْهُم قَبِيحٌ، وَمِنْهُمْ حَسَنْ	فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، وَمِنْهُمْ سَعِيد

অর্থ: তুমি যা চাও তা হয় যদিও না চাই আমি।

যা আমি চাই তা হয় না যদি না চাও তুমি।

তুমি বান্দাদের সৃষ্টি করেছ যা তুমি পূর্ব থেকে জ্ঞাত।

তোমার জ্ঞানেই হয় তারুণ্য ও বার্ধক্য।
কারো প্রতি অনুগ্রহ কর, কাউকে কর অপমান।
কাউকে সাহায্য আর কাউকে কর না দান।
তাই কেউ হয় দুর্ভাগা আর কেউ ভাগ্যবান।
আর কেহ হয় অধম কেউ শ্রীমান।

নবম প্রমাণ: ﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ﴾ (তাঁর কুরসী (পাদানি) সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে):

কুরসী আল্লাহ তা'আলার বৃহৎ সৃষ্টির একটি। আল্লাহ সুবহানাহু এটির বর্ণনায় বলেন যে, আকাশ এবং যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। তার প্রশস্ততা, আকৃতির বড়ত্বতা এবং ক্ষেত্রের বিশালতার কারণে। ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের তুলনা কুরসীর সাথে খুবই ক্ষীণ তুলনা। যেমন, কুরসীর তুলনা 'আরশের সাথে দুর্বল তুলনা। আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস এটি বিশ্লেষণ করে। তিনি বলেন,

«دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْـهِ ، فَقُلْتُ : يَـا رَسُـولَ اللَّهِ ، أَيُّ آيَـةٍ نَـزَلَتْ عَلَيْـكَ أَفْضَـلُ ؟ قَـالَ :«آيَـةُ الْكُرْسِيِّ، مَـا السَّـمَاوَاتُ السَّـبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلاةٍ، وَفَضْـلُ الْعَـرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ»

“আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকি দেখে তার পাশে বসে পড়ি এবং জিজ্ঞাসা করি: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সর্বোত্তম কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়? তিনি বলেন, “আয়াতুল কুরসী; কুরসীর তুলনায় আকাশ এবং যমীন, যেমন মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি বালা (আংটা)। আর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব কুরসীর প্রতি যেমন মরুভূমির শ্রেষ্ঠত্ব সেই বালার প্রতি”।[29]

---

[29] হিল্ইয়াহ, ১/১৬৬, আযামাহ, ২/৬৪৮-৬৪৯, আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩০০-৩০১, শাইখ আলবানী সহীহ বলেন। সিলসিলা সহীহাহ, নং (১০৯)।

হাদীসটি এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের স্থানে বর্ণিত হয়েছে, যেন বান্দা এই সৃষ্টির বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তুলনা করতে সমর্থ্য হয় তার এবং আকাশ ও যমীনের মাঝে। তারপর তার ও আরশে আযীমের মাঝে তুলনায় এর ক্ষুদ্র হওয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।

এখানে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে, মরুভূমিতে পড়ে থাকা ছোট বালার স্থান মরুভুমির তুলনায় কতখানি। (খুবই নগন্য) অনুরূপ কুরসীর অবস্থা 'আরশের তুলনায়। অতঃপর যমীন আসমানের স্থান কুরসীর তুলনায় সেরূপ নগণ্য।

যদি আপনি চিন্তা করেন এই যমীনের সম্পর্কে যাতে আপনি চলা-ফেরা করেন, বেষ্টনকারী পাহাড়ের তুলনায়। বলুন তো, সাধারণ যমীনের তুলনায় পাহাড়সমূহের স্থান কতখানি। তারপর সমগ্র যমীনের (যমীনের অভ্যন্তর স্তর সহ) তুলনায় তার অবস্থান। তারপর আকশসমূহের তুলনায় এটির স্থান। তারপর

কুরসীর তুলনায় এটির স্থান, যে কুরসী আকাশ এবং যমীনকে পরিব্যপ্ত করে আছে। তারপর ‘আরশে আযীমের তুলনায় এটির অবস্থান। যেন আপনি অনুভব করতে পারেন বৃত্তের অতি ক্ষুদ্রতা, যাতে আপনি বসবাস করেন। যেন এ চিন্তার মাধ্যমে জানতে পারেন মহান আল্লাহর সৃষ্টির বড়ত্ব, যা স্রষ্টা ও আবিষ্কারকের মহত্ত্বের প্রমাণ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله»

“তোমরা আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শণসমূহে চিন্তা কর, আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা কর না”।[30] এটি বরকতপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা যার দ্বারা বান্দা আবিষ্কারকের মহত্ত্বতা এবং স্রষ্টার পূর্ণতার সঠিক জ্ঞান পায়। জানতে পারে যে, তিনি আল্লাহ সুবহানুহু খুবই বড়, সুউচ্চ এবং সুমহান। এ কারনে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, এ স্থানে কুরসীর বর্ণনা, আল্লাহর সুউচ্চতা এবং তাঁর মহত্ত্বতার বর্ণনার উদ্দেশ্যে ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ হয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি যখন এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে, তখন তার রবের সম্মুখে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করবে এবং যাবতীয় ইবদত তাঁর জন্যে করবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ না। জানতে পারবে যে, প্রত্যেক মুশরিক তার রবের যথার্থ সম্মান করে না। যেমন, আল্লাহু তা‘আলা বলেন,

---

[30] শারহুল্ ইতেকাদ, লাআল্কায়ী, ২/২১০, শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন। সিলসিলা সহীহাহ, নং ১৭৮৮।

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٧﴾ [الزمر: ٦٧]

“তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাজকৃত তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] এবং তিনি বলেন,

﴿مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ١٣ وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا ١٤ أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا ١٥ وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا ١٦ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ بِسَاطٗا ١٩ لِّتَسۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُلٗا فِجَاجٗا ٢٠﴾ [نوح: ١٣، ٢٠]

“তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? অথচ তিনিই তোমাদেরকে

সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, তোমরা লক্ষ্য কর নি? আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে? তিনি তোমাদের উদ্ভুত করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত, যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।” [সূরা নূহ, আয়াত: ১৩-২০]

জানি না কোথায় গুম হয়ে যায় এই সমস্ত মুশরিকদের বিবেক-বুদ্ধি! যখন তারা তাদের বিনয়-নম্রতা, অসহায়তা-অক্ষমতা, আশা-আকাঙ্খা, ভয়-ভীতি, ভালোবাসা এবং কামনা-বাসনা নিবেদন করে, দুর্বল-অক্ষম সৃষ্টির কাছে, যারা নিজের লাভ-লোকসানের মালিক নয় অপরের মালিক হওয়া তো দুরের কথা; আর বিনয়-নম্রতা নিবেদন করা ছেড়ে দেয় মহান আল্লাহ এবং মর্যাদাবান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। তারা যা বলে

তা থেকে তিনি কত উর্ধ্বে। তিনি পবিত্র তা থেকে যাকে তারা তাঁর সাথে শরীক করে থাকে।

দশম প্রমাণ: ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا﴾ (উভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না।):

এটিও আল্লাহর মাহাত্ম্য এবং তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির পূর্ণতার বর্ণনা। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, কুরআনে না-সূচক কোনো কিছু শুধু না বলার জন্য ব্যবহৃত হয়না বরং তাতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার প্রমাণ শামিল হয়। তাঁর বাণী: (وَلَا يَئُودُهُ) লা-ইয়াউদহু-অর্থাৎ তাঁকে চিন্তিত করে না, কাঠিন্যতায় ফেলে না এবং ক্লান্ত করে না। (হিফ্ যুহুমা)-উভয়ের সংরক্ষণ- অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনের সংরক্ষণ। এতে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণতার প্রমাণ হয় এবং প্রমাণ হয় যে তিনি সংরক্ষক, আকশমণ্ডলী এবং যমীনের সংরক্ষণকারী। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنۡ أَمۡسَكَهُمَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ٤١﴾ [فاطر: ٤١]

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রাখেন যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে এগুলোকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ"। [সূরা ফাতির, আয়াত: ৪১]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلۡأَرۡضُ بِأَمۡرِهِۦۚ﴾ [الروم: ٢٥]

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৫] এতেও আল্লাহর প্রতি সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হয়। তাদের অবস্থান তাঁর নির্দেশে এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁর ইচ্ছায়। তাঁর ক্ষমতায় তিনি তাদের ধারক। সৃষ্টির ওপর কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে তাঁর জন্য

ইবাদত করা, তাঁরই উদ্দেশ্যে আনুগত্য খাঁটি করা। শির্ক ও শরীক হতে তাঁকে মুক্তকরণের ব্যাপারে এটি একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। দুর্বল সৃষ্টি এবং লাঞ্ছিত বান্দাকে কেমন করে তার প্রভূ ও স্রষ্টার সমতুল্য নির্ধারণ করা হতে পারে? কিভাবে সংরক্ষিত ব্যক্তি সংরক্ষকের সমতুল্য হতে পারে? সর্বক্ষেত্রে অভাবী, পদদলিত কেমন করে অভাবমুক্ত প্রসংশিতের সমকক্ষ হতে পারে। তাদের শির্ক থেকে তিনি উর্ধ্বে।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “এটা অজ্ঞতা এবং অত্যাচারের শেষ সীমা। কীভাবে মাটিকে মুনিবদের মুনিবের সাথে তুলনা করা হবে? কীভাবে দাসকে মালিকের মতো মনে করা হবে? কেমন করে দুর্বল, সত্তাগতভাবে অক্ষম, সত্তাগতভাবে অভাবী, সত্তাগতভাবে অস্তিত্বহীন হওয়াই যার আসল কথা, সে সত্তাগতভাবে অমুখাপেক্ষী, সত্তাগতভাবে সক্ষম, যার অমুখাপেক্ষিতা, ক্ষমতা, রাজত্ব, তাঁর সত্তার আবশ্যিক অংশ, তার সমকক্ষ হতে পারে? এর চেয়ে জঘন্য যুলুম আর কী হতে পারে? এর চেয়ে মারাত্মক কঠিন

যুলুমপূর্ণ বিধান আর কী হতে পারে? যেখানে এমন সত্তাকে তার সৃষ্টির সমকক্ষ সাব্যস্ত করা হচ্ছে যার সমকক্ষ আসলে কেউ নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝١﴾ [الانعام: ١]

“সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আলো ও অন্ধকার; তা সত্ত্বেও কাফিররা অপর জিনিসকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করছে।” [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১]

মুশরিকরা সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে আকাশ ও যমীন, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টিকারীর সাথে এমন কাউকে, যে আকাশ ও যমীনের অনু পরিমাণ কোনো কিছুর, না নিজে মালিক, না অপরের জন্য মালিক। আফসোস

এমন সমকক্ষ স্থাপনের, যাতে আছে বড় যুলুম ও বড় জঘন্যতা।[31]

একাদশ এবং দ্বাদশ প্রমাণ: ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾ (তিনি সুউচ্চ, মহীয়ান):

এ দু'টি তাওহীদের অন্যতম প্রমাণ। এগুলো প্রমাণ করছে যে, তিনি সুবহানাহুই ইবাদাতের হকদার, অন্য কেউ নয়। সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাঁর উচ্চতা এবং তাঁর মাহাত্মের পূর্ণাঙ্গতা বর্ণনার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী (وَهُوَ الْعَلِيُّ) এর মধ্যে বর্ণিত "আলিফ-লাম"টি ইস্তিগরাক তথা সম্পূর্ণবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি উচ্চতা বলতে যা বুঝায়, সেরকম সব অর্থকে শামিল করে। যেমন, সত্তাগত উচ্চতা, ক্ষমতাগত উচ্চতা এবং মর্যাদাগত উচ্চতা। (কবি বলেন),

31 আল-জাওয়াব আল-কাফী ১৫৬।

وله العلو من الوجوه جميعها	ذاتًا وقهرًا مع علو الشان

অর্থ: তাঁর জন্য উচ্চতা সর্বক্ষেত্রে। অবস্থান ও সত্তাগত, ক্ষমতাসম্পর্কীয়, মর্যাদার উচ্চতাও বটে।

তাই তিনি তাঁর সত্তাসহ উঁচুতে রয়েছেন, সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

“দয়াময় (আল্লাহ) ‘আরশের উপর উঠেছেন।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫]

তিনি সার্বভৌমত্বের দিক দিয়েও সুউচ্চে। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ﴾ [الانعام: ١٨]

“তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৮]

তিনি তাঁর সম্মানের দিক দিয়েও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓ﴾ [الزمر: ٦٧]

“তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।’ [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭]

এটি তাওহীদের প্রমাণাদির মধ্যে একটি বৃহৎ প্রমাণ এবং শির্কের খণ্ডন। এ কারণে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٦٢﴾ [الحج: ٦٢]

“এ জন্যেও যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে এটা তো অসত্য এবং আল্লাহ- তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৬২]

এবং তাঁর বাণী: (الْعَظِيم) এতে তাঁর মহত্বের প্রমাণ হয় এবং প্রমাণ হয় যে, তাঁর চেয়ে মহান আর কিছু নেই। আরও প্রমাণ হয় যে, মাখলুকের মর্যাদা, সে যত বড়ই হোক না কেন, তার অবস্থা এতই হীন যে তার সাথে

মহান সৃষ্টিকর্তা এবং অস্তিত্বে আনয়নকারীর মহত্বের তুলনা করা যায় না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَـةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَـازَعَنِي وَاحِـدًا مِنْهُمَـا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»

"অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার লুঙ্গি, যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোনো একটি নেওয়ার চেষ্টা করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব"।[32]

এই নামের সাথে সম্পর্কিয় উপাসনাদির মধ্যে হচ্ছে বান্দা যেন তাঁর রবের সম্মান করে, তাঁর সামনে হীনতা অবলম্বন করে এবং তাঁর মহান সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রকাশ করে। বিনয় নম্রতা এবং আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্য করে। কিছু লোককে শয়তান ধোকা দিয়েছে তারা এই সত্যকে বদলে দিয়েছে এবং স্পষ্ট শির্কে নিমজ্জিত হয়েছে এবং শয়তানকে আল্লাহর

[32] আহমদ, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন। হাদীস নং ৫৪০।

সম্মানের আসনে বসিয়েছে। তারা বলছে: আল্লাহ তা'আলা মহান মহিয়ান। তাঁর নৈকট্য, মধ্যস্থতাকারী, সুপারিশকারী, নিকটবর্তীকারী উপাস্য ছাড়া লাভ করা যেতে পারে না। আসলে কোনো বাতিলপন্থীই তার বাতিলের প্রচার-প্রসার ঘটাতে পারে না যতক্ষণ না সে বাতিলকে সত্যের মোড়কে পেশ করে।

আবদুর রহমান ইবন মাহদী রাহিমাহুল্লাহর কাছে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের কথা বলা হলো যে, তারা আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্পর্কীয় হাদীসগুলোকে অস্বীকার করে এবং বলে: এই ধরনের গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলা মহান। তখন তিনি বলেন, "এক সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে সম্মানকে কেন্দ্র করে, তারা বলেছে: আল্লাহ তা'আলা কিতাব অবতরণ করা কিংবা রাসূল প্রেরণ করা থেকে উর্ধ্বে। তারপর তিনি পড়েন:

﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ [الانعام: ٩١]

“এই লোকেরা আল্লাহ তা‘আলার যথাযথ মর্যাদা উপলদ্ধি করে নি। যখন তারা বলেছে, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কোনো কিছু অবতীর্ণ করেন নি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯১], তারপর তিনি (ইবনে মাহদী) বলেন, অগ্নিপুজকরা তো সম্মানকে কেন্দ্র করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা বলে: আল্লাহ এটি থেকে মহান যে আমরা তাঁর ইবাদত করব বরং আমরা ইবাদত করব তার যে আমাদের চেয়ে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী। তাই তারা সূর্যের ইবাদত করে এবং সাজদাহ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন:

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]

“যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে (তারা বলে,) আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩][33]

---

[33] আল-হুজ্জাহ, তায়মী-১/৪৪০।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্বন্ধে এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা, যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শির্ক এবং অংশী স্থাপনে লিপ্ত করেছে। মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারী সাব্যস্ত করছে, তারা মনে করছে এ দ্বারা তারা রাব্বুল আলামীনের সম্মানই করছে। বস্তুত সত্যিই যদি তারা তাদের প্রভূ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত, তবে তারা তাঁর যথার্থ তাওহীদ সাব্যস্ত করতো।

[একটি মহান মূলনীতি]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “এটির বর্ণনার পর এখানে এক মূলনীতি পাওয়া যায়, যা উক্ত বিষয়ের রহস্য উন্মোচন করে দেয়, আর তা হলো: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, তাঁর সম্পর্কে কু-ধারণা রাখা। কারণ, কু-ধারণা পোষণকারী তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা রাখে, যা তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং গুণাবলীর বরখেলাফ। এ কারণে আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণকারীদেরকে ধমক দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرٗا﴾ [الفتح: ٦]

"অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; এটা কত নিকৃষ্ট আবাস!" [সূরা আল-ফাত্‌হ, আয়াত: ৬]

তাঁর কোনো গুণ অস্বীকারকারীর সম্পর্কে বলেন,

﴿وَذَٰلِكُمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمۡ أَرۡدَىٰكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم مِّنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣﴾ [فصلت: ٢٣]

"তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত: ২৩]

আল্লাহ তাঁর খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, তিনি তাঁর গোত্রকে বলেন,

﴿مَاذَا تَعۡبُدُونَ ٨٥ أَئِفۡكًا ءَالِهَةٗ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٨٦ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨٧﴾ [الصافات: ٨٥، ٨٧]

“তোমরা কিসের পূজা করছ? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা মা‘বুদগুলোকে চাও? জগতসমূহের রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?” [সূরা সাফ্ফাত, আয়াত: ৮৫-৮৭] অর্থাৎ অন্যের ইবাদত করার পর তোমাদের কী মনে হয়? তোমাদের আল্লাহ কী বদলা দিতে পারেন যখন তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে? তাঁর নামাবলী, গুণাবলী এবং রুবুবিয়্যাতের সম্বন্ধে তোমরা কতই না বেশি খারাপ ধারণা পোষণ করছ, যার ফলে তোমরা অন্যের দাসত্বমুখী হয়ে গেছ?

যদি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সে ধারণা রাখতে যা তিনি প্রাপ্য, তাহলে তা কতই না ভালো হত, আর তা হচ্ছে, তিনি সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত, সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তিনি তাঁর সত্তার বাইরে সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, আর সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি ন্যায়বিচারক। সৃষ্টিকে পরিচালনার ব্যাপারে তিনি একক, এ ক্ষেত্রে তাঁর কেউ অংশী নেই। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়াদির তিনি যথার্থ জ্ঞানী, তাই সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়। তিনি একাই

তাদের জন্য যথেষ্ট, তাই কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর সত্তাসহ পরম করুণাময়, তাই দয়া করার ব্যাপারে তিনি কারো সহানুভূতির প্রয়োজন মনে করেন না। এটা রাজাগণ এবং অন্যান্য শাসকদের বিপরীত। কারণ, তারা মুখাপেক্ষী এমন লোকের, যারা তাদেরকে প্রজাদের অবস্থা এবং সমস্যার সম্পর্কে অবগত করাবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে। মুখাপেক্ষী এমন লোকের, যে তাদের সুপারিশের মাধ্যমে দয়াপ্রার্থী এবং সহানুভূতির তলবকারী হবে। এ কারণে তাদের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়েছে তাদের সমস্যা, দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং তাদের জ্ঞানে স্বল্পতার কারণে। কিন্তু যিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সবকিছু হতে অমুখাপেক্ষী, সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক জ্ঞানী, পরম করুণাময় দয়ালু, যার দয়া সবকিছুকে শামিল করেছে। এ রকম গুণে গুণান্বিত সত্তা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম স্থাপন করা আসলে তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভূত্ব) উলুহিয়্যাত (ইবাদত-সংক্রান্ত) এবং একত্ব সম্পর্কীয় ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা ছোট করা এবং

তাঁর সম্পর্কে কু-ধারণা রাখা ছাড়া আর কি। এটি কখনও তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে বৈধ করেন নি। সুবিবেক এবং সু স্বভাবও এর বৈধতা অস্বীকার করে। আর এর জঘন্যতা সুবিবেকের কাছে অপরাপর সকল জঘন্যতার উপরে স্থান পায়।

এর বিশ্লেষণ এইরূপ: অবশ্যই উপাসনাকারী তাঁর উপাস্যকে সম্মান করে, উপাস্যের মর্যাদা দেয় এবং তাঁর জন্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে। অন্যদিকে মহান রব আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন এককভাবে পূর্ণ সম্মান, মর্যাদা, ভালোবাসা এবং বিনয় পাওয়ার হকদার। এটা তাঁর একচ্ছত্র হক। তাই তাঁর হক অন্যকে দেওয়া অথবা তাঁর হকের মাঝে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করা জঘন্য যুলুম-অত্যাচার। বিশেষ করে তাঁর হকে শরীককৃত ব্যক্তি যদি তাঁর বান্দা এব দাস হয় তাহলে তা হবে আরো জঘন্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ

كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

[الروم: ٢٨]

“আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন: তোমাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর? এভাবেই আমরা বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শণাবলী বর্ণনা করি।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৮] অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপছন্দ করে যে, তার দাস তার সম্পদে অংশীদার হোক, তাহলে কীভাবে আমার দাসদের মধ্যে কাউকে আমার অংশীদার করে থাক, যে বিষয়ে আমি একক? আর সে বিষয়টি হচ্ছে, ইবাদত বা উপাসনা, যা আমি ব্যতীত অন্যের জন্যে কখনো সমীচীন নয়, আমি ছাড়া অন্যের জন্য অগ্রহণযোগ্য।

সুতরাং যে কেউ এমন ধারণা রাখবে, সে আমাকে যথোচিত মর্যাদা দিল না, যথাযথ সম্মান করল না,

আমাকে একক মনে করলো না, যে বিষয়ে আমি একক কোনো সৃষ্টি নয়। সে ব্যক্তি যথাযথ আল্লাহর সম্মান করলো না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করলো। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ ٧٣ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٧٤﴾ [الحج: ٧٣، ٧٤]

“হে লোকসকল! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগসহ তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও পারবে না এবং মাছি যদি সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট থেকে, এটাও তারা এর নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল! (বস্তুত) তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা

দেয় না; আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৩-৭৪]

তাই সে ব্যক্তি আল্লাহর যথাযথ সম্মান করলো না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে এমন কারো ইবাদত করলে যে অতি দুর্বল এবং অতি ছোট প্রাণী সৃষ্টি করতে অক্ষম এবং তার নিকট থেকে যদি মাছি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাও উদ্ধার করতে অপারগ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٧﴾ [الزمر: ٦٧]

“তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাজকৃত তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] যার এই

মহিমা ও মহত্ব তাঁর সে যথাযথ সম্মান করে না, যে তাঁর ইবাদতে অন্য এমন কাউকে শরীক করে যার এতে কোনোই অংশ নেই, বরং সে সবচেয়ে দুর্বল ও অক্ষম। তাই সে ব্যক্তি শক্তিশালী ক্ষমতাবান আল্লাহর যথাযথ সম্মান করলো না, যে ব্যক্তি দুর্বল পদদলিতকে তাঁর সাথে শরীক করলো"।[34]

---

[34] আল-জাওয়াব আল-কাফী ১৬২-১৬৪।

[উপসংহার]

এ হচ্ছে তাওহীদের ১২টি প্রমাণ, যা এই মহান আয়াতে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর তাতে এ বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে যে, অবশ্যই এক আল্লাহই উপাসনার ক্ষেত্রে একক, ইবাদতের হকদার আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই। একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ হবে, সে যেন দিন-রাত এ আয়াতস্থলে গবেষণামূলক চিন্তা-ভাবনা করতঃ তাওহীদ ও ইখলাসকে কেন্দ্র করে যা বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করে। আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক ও অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত থাকে। মহান রবের উদ্দেশ্যে তাঁর সুন্দর নামাবলী এবং মহান গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পাঁচটি সুন্দর নাম এবং বিশটিরও অধিক গুণের বর্ণনা রয়েছে, যা মহান রবের পূর্ণতা, তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং মহিমা প্রমাণ করে। যার জন্যে চেহারা অবনত, আওয়াজ বিনম্র, তাঁর ভয়ে অন্তর শঙ্কিত এবং গর্দানসমূহ অনুগত। তিনি আল্লাহ, মহান, দু' জাহানের

রব। এই আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কতই না মহত্ত লাভ এবং অঢেল কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

[আন্তরিক আহ্বান]

আমি এ স্থানে বলতে চাই, এই আয়াতটির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে এবং আয়াতটি যা প্রমাণ করে তা উপলব্ধি করা থেকে সেই সমস্ত লোকদের বিবেক কোথায় গুম হয়ে যায়, যারা এ আয়াত অধ্যায়ন করে। যারা কবরের সম্মান, সেখানে অবস্থান এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করার ব্যাধিতে লিপ্ত। যারা কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নযরানা-উপঢৌকন পেশ করে, সেখানে কুরবানী দেয়, প্রয়োজন কামনায় সেদিকে মনোযোগ দেয় এবং তাদের এমন সম্মান দেয় যা আকাশ যমীনের রব ছাড়া অন্যের জন্যে একেবারে অনুচিত। যে ব্যক্তি কবরের নিকট তাদের এ সমস্ত কার্যকলাপ দেখবে সে আশ্চর্য জিনিস দেখতে পবে। ইবনুল কাইয়েম রহ. বলেন, “যদি আপনি অতিরঞ্জনকারীদের দেখেন যারা কবরের নিকট মেলা লাগায়, তো দেখতে পাবেন তারা গাড়ি-ঘোড়া থেকে অবতরণ করে, যখন দূর থেকে সে স্থান দেখতে পায়। অতঃপর তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কপাল ঠেকায় (সাজদাহ করে), মাটি

চুম্বন করে, মাথা খোলা রাখে, শোরগোল করে, এক অপরকে দেখাদেখি করে কাঁদে যার ফলে ক্রন্দনের আওয়াজ শোনা যায় এবং মনে করে তারা হজ্জের চেয়েও অধিক নেকী অর্জন করেছে। এভাবে তারা এমন কারও কাছে ফরিয়াদ জানায় যে না অস্তিত্বদান করতে সক্ষম আর না পুনরাবর্তন ঘটাতে পারঙ্গম। তারা কবরবাসীদের ডাকতে থাকে বহু দূর হতে। তারপর যখন নিকটস্থ হয় তখন কবরের কাছে দুই রাকাত সালাত পড়ে। এরপর মনে করে তারাই নেকীর ভাণ্ডার লাভ করেছে, অথচ যারা এ জাতীয় দু' কিবলার দিকে সালাত পড়েছে সে কোনো সওয়াব অর্জন করতে সক্ষম হবে না। তাদের দেখতে পাবেন কবরের চতুষ্পার্শে রুকু এবং সাজদারত অবস্থায়, মৃতলোকদের কৃপা এবং সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে। আসলে তাদের হাতে জমা হচ্ছে নিরাশা এবং ব্যর্থতা। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য বরং শয়তানের জন্য সেথায় অশ্রু ঝরানো হয়। কণ্ঠ উচ্চকিত হয়। মৃত ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন চাওয়া হয়, বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া হয়, দারিদ্রতা

দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং অসুস্থতা হতে সুস্থতা কামনা করা হয়। তারপর তাদেরকে দেখবেন কবরের চতুষ্পার্শে তাওয়াফে মনযোগ দিতে, যেন তা বায়তুল হারাম যাকে আল্লাহ করেছেন বরকতপূর্ণ এবং দুই জাহানের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। তারপর তারা সেসব কবরকে চুম্বন এবং স্পর্শ করতে লেগে যায়। আপনি কি হাজরে আসওয়াদকে দেখেছেন তার সাথে বায়তুল হারামের অতিথিরা কী করে? (সে সব লোকে কবরের কাছে অনুরূপ কাজটিই করে থাকে) তারপর সেখানে মাটিতে ঘর্ষণ করা হয় সেই সমস্ত কপাল ও গাল, যা আল্লাহ জানেন যে তাঁর দরবারে সাজদার সময় অনুরূপ ঘর্ষণ করা হয় না। অতঃপর তারা কবরের হজ পূর্ণ করে চুল চাঁটে বা কাটে। সেই মূর্তি থেকে পাওয়া অংশ দ্বারা তারা উপকৃত হতে চায়, আসলে তারাই সেটা করে আল্লাহর কাছে যাদের কোনো অংশ নেই। তারা কবর নামক সে প্রতিমার উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করে। আসলে তাদের সালাত, তাদের উপঢৌকন ও কুরবানী হয় রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের

উদ্দেশ্যে। আপনি তাদের দেখবেন এক অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে, তারা বলে: আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে অধিক ও উত্তম বদলা দিন! আর যখন তারা দেশে ফিরে তখন অনুপস্থিত অতিরঞ্জণকারীরা আবেদন করে, তোমাদের কেউ আছে কি যে কবরের হজকে বায়তুল্লাহর হজের বিনিময়ে বদল করবে? উত্তরে বলা হয়, না, তোমার প্রতি বছরের হজ্জের বিনিময়েও নয় !!!

এটি সংক্ষিপ্ত, আমরা তাদের ব্যাপারে বাড়তি কিছু বলি নি, আর না তাদের সমস্ত বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। আসলে সেগুলো তো বিবেক ও কল্পনায় যা আসে না তারও বাইরে।”[35]

এই সমস্ত বিপথগামী পথভ্রষ্টদের আক্কেল কোথায় হারিয়ে গেছে! কী আশ্চর্য! তারা তাদের নিজেদের মত বান্দাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, তাদের মহান

[35] ইগাসাতুল লাহফান ১/২১৩।

প্রতিপালকের ইবাদত ছেড়ে বসেছে। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٤﴾ [الاعراف: ١٩٤]

“আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৪]

তারা আল্লাহর সম্পর্কে যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং যা শির্ক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।

এ প্রকার লোকদের জন্য এবং অন্যান্যদের জন্য এ মহৎ আয়াতটির অধ্যয়ন এবং এর মহান প্রমাণাদির সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্যে, এই পুস্তিকাটি একটি আহ্বান। এর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে এ আয়াতে বর্ণিত স্পষ্ট প্রমাণাদি এবং উজ্জ্বল

দলীলসমূহের মাধ্যমে সাব্যস্ত তাওহীদ ও ইখলাস সম্পর্কীয় বিধি-বিধান এবং শির্ক ও অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত করণের আহ্বান।

হে আল্লাহ! তোমার হিদায়াতের তাওফীক দান করো! আমাদের আমলকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করো! আমাদের কথা ও কাজে ইখলাস দাও! তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী, তুমিই আশারস্থল, তুমিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং অতি উত্তম কর্মবিধায়ক।

আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সহচরগণের প্রতি।

আয়াতুল কুরসী ও তাওহীদের প্রমাণ: গ্রন্থকার এ গ্রন্থে আয়াতুল কুরসীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, কীভাবে এটি কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো তাও ব্যক্ত করা হয়েছে, সাথে সাথে এ আয়াতে তাওহীদের যেসব প্রমাণাদি রয়েছে তাও বিবৃত হয়েছে।